هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল বাকারাহ
২

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(১) হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায়। এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহুদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত,

www.icsbook.info

অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।[১] তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোন ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অন্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিষ্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম' নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক 'ইহুদি' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকূ' এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু'রুকূ'তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ' বছর আগে হযরত মূসার (আ) যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে হযরত মূসা (আ) খৃ. পূ. ১২৭২ অব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

www.icsbook.info

(২) মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে ঐ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকূ'তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে।

(৩) হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট্ট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিন, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব-অনটন, অনাহার-অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোন দিক থেকে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীমের (সা) মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই

www.icsbook.info

মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃংখল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

www.icsbook.info

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

আর যেখান থেকেই তুমি চল না কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো, যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারে—[১৫০] তবে যারা যালেম, তাদের মুখ কোন অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো—আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো[১৫১] এবং এই আশায়[১৫২] যে, আমার এই নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে যেমনিভাবে (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে,) আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না।

যাকে নামায পড়তে হবে তাকে অবশ্যি কোন না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে। কিন্তু যেদিকে মুখ ফেরানো হয় সেটা আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই নেকী ও কল্যাণগুলো যেগুলো অর্জন করার জন্য নামায পড়া হয়। কাজেই দিক ও স্থানের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ
اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ
رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৯ রুকূ’

হে ঈমানদারগণ![১৫৩] সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।[১৫৪] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।[১৫৫] আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে ঃ “আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে,[১৫৬]—তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১৫০. অর্থাৎ আমাদের এই নির্দেশটি পুরোপুরি মেনে চলো। কখনো যেন তোমাদের ভিন্নরকম আচরণ না দেখা যায়। তোমাদের কাউকে যেন নির্দিষ্ট দিকের পরিবর্তে কখনো অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখা না যায়। অন্যথায় শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করার সুযোগ পাবে ঃ আহা, কী চমৎকার ‘মধ্যপন্থী উম্মাত’! এরাই হয়েছে আবার সত্যের সাক্ষী! এরা মুখে বলে, এই নির্দেশটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে কিন্তু কাজের সময় এর বিরুদ্ধাচরণ করছে।

১৫১. এখানে অনুগ্রহ বলতে নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের থেকে কেড়ে নিয়ে এই নেতৃত্ব উম্মাতে মুসলিমাকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ প্রণীত বিধান অনুযায়ী একটি উম্মাতকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহর ইবাদাতের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করা ছিল তার সত্যানুসারিতার চরম পুরস্কার। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উম্মাতকে দেয়া হয়েছে তার ওপর আসলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ

www.icsbook.info

এখানে বলছেন, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের এ নির্দেশটি আসলে এই পদে তোমাদের সমাসীন করার নিশানী। কাজেই অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর প্রকাশ ঘটলে যাতে এ পদটি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় সে জন্যও তোমাদের আমার এই নির্দেশ মেনে চলা দরকার। এটা মেনে চললে তোমাদের প্রতি এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

১৫২. অর্থাৎ এই নির্দেশ মেনে চলার সময় মনে মনে এই আশা পোষণ করতে থাকো। এটা একটা রাজকীয় বর্ণনাভংগী মাত্র। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর কোন চাকরকে বলে দেয়া হয়, বাদশাহর পক্ষ থেকে অমুক অমুক অনুগ্রহ ও দানের আশা করতে পারো, তখন কেবলমাত্র এতটুকু ঘোষণা শুনেই সংশ্লিষ্ট চাকর বা রাজকর্মচারী তার গৃহে আনন্দ-উল্লাস করতে পারে এবং লোকেরাও তাকে মোবারকবাদ দিতে পারে।

১৫৩. নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

১৫৪. অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে।

১৫৫. মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

www.icsbook.info

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।

নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তরভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে[১৫৭] তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঈ' করায় কোন গোনাহ নেই।[১৫৮] আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে,[১৫৯] আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৬. বলার অর্থ কেবল মুখে বলা নয় বরং মনে মনে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, "আমরা আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন।" তাই আল্লাহর পথে আমাদের যে কোন জিনিস কুরবানী করা হয়, তা ঠিক তার সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। যার জিনিস ছিল তার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর "আল্লাহরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"—এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে হবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পথে লড়াই করে প্রাণ দান করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটাই তো ভালো। এভাবে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার চাইতে লাখো গুণে শ্রেয়।

১৫৭. যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত তারিখে কা'বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য সময় কা'বা যিয়ারত করাকে উমরাহ বলে।

১৫৮. সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করা বা দৌড়ানো ছিল অন্যতম। পরে মক্কায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্তলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর 'আসাফ' ও মারওয়ার ওপর 'নায়েলা'র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয়। এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তরভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উদ্ভূত কোন অনুষ্ঠান? কাজেই এই ধরনের একটি কর্মকে হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তরভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে

www.icsbook.info

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ
عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।[১৬০] তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তাদের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়। তাছাড়া হযরত আয়েশার (রা) রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কারণ তারা ছিল 'মানাত'-এর ভক্ত। 'আসাফ' ও 'নায়েলা'কে তারা মানতো না। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিব্‌লাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু'টির মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলে লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর এই সংগে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু'টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।

১৫৯. অর্থাৎ নির্দেশ মানার জন্য তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, তবে ভালো হয় যদি মানসিক আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে তা করো।

১৬০. ইহুদি আলেমদের বৃহত্তম অপরাধ এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে তাকে রাব্বী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ জনমানুষ তো দূরের কথা ইহুদি জনতাকেও এই জ্ঞানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। সাধারণ অজ্ঞতার কারণে জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতার শিকার হলো তখন ইহুদি আলেমসমাজ জনগণের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়নি। বরং উল্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য যে ভ্রষ্টতা ও শরীয়াত বিরোধী কর্ম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এই ধরনের প্রবণতা ও কর্মনীতি অবলম্বন না করার জন্য

www.icsbook.info